সাহিত্যের আলোয় গান্ধীজী

সুপ্রিয় মুন্সী

সাহিত্য মনের দর্পন, সাহিত্য সমাজেরও দর্পন। সাহিত্যিক তাঁর মনের রং মিশিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু সামাজের প্রেক্ষিত যেমন তার ওপরে ক্রিয়া করে, তেমনি নতুন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রম তাকে আলোড়িত করে ও নবসৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়। 'সহ-হিত' শব্দ থেকে উদ্ভুত সাহিত্য অবশ্যই সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা নির্বাহ করে।

সাহিত্যের পরিধি অবশ্য বিশাল ও তার বিস্তারও নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত। মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে এক নতুনতর সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে যা 'গান্ধী সাহিত্য' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। কেবল বিশ্বের সবকটি ভাষাতেই নয়, সম্ভবত গান্ধীজী, তাঁর জীবন, কর্ম, কার্যক্রম ও চিন্তাভাবনা নিয়ে যত সাহিত্য রচিত হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে তা এখনি বিস্ময়কর সংখ্যায় পৌঁছে গেছে ও প্রায় প্রতিদিনই সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটছে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে এমনকি বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাতেও গান্ধী চিন্তাভাবনার প্রভাব ও প্রকাশ ঘটছে। এক্ষেত্রে ফ্রিটজফ্ কাপরার 'টাও অফ্ ফিজিক্স' - এর কথা এখনি মনে আসছে।

গান্ধীজী নিজেই অবশ্য বড় সাহিত্যিক ছিলেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতই সূর্যের নীচে যা কিছুই আছে সেই সব বিষয়ে অফুরন্ত লিখেছেন। অবশ্য সাহিত্যিক বা লেখক পরিচিতি তিনি কোনদিনই দাবী করেননি।

মহাত্মা গান্ধী ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে ও গত শতকের প্রারম্ভে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় নীপীড়িত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার স্থাপনে যখন আন্দোলন করছেন তখন আন্দোলনের অভিনবত্ব ও 'গান্ধী-চরিত' এদেশের কিছু সাহিত্যিক, যেমন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বয়ং কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও কবিতা ও অন্যবিধ রচনায় প্রকাশ লাভ করেছে -

> ''শুরু হল নতুন নাট্য সূত্রধরের নূতন নাট
> সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ''.
>
> (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইজ্জতের জন্য')

কিন্তু ১৯১৫ সালে তাঁর ভারত - প্রত্যাবর্তন, বিদেশী রাজের বিরুদ্ধে নব নব আন্দোলন যেমন আমাদের সাহসী করে তুলছে ও ন্যায্য দাবী প্রচেষ্টায় আমদের অনুপ্রাণিত করছে, তেমনি তাঁর অত্যন্ত মানবিক চিন্তা-ভাবনা ও গঠনমূলক কার্যক্রম, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, একাদশ ব্রত, তদুপোরি সংগ্রামের এক নতুন, যুগান্তকারী হাতিয়ার সত্যাগ্রহ, সহজ জীবনযাত্রা, বঞ্চিত, নীপীড়িত সমাজের নীচুতলায় অবস্থিত মানুষজনকে নতুন পরিচিতি দিয়ে ওপরে তুলে আনার প্রচেষ্টা, এক জাতীয় পরিচিতি ও ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা, এক নব মাতৃভূমি, কেবল ভারতীয় সাহিত্যিকদেরই নয়, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তার আলোচনা ও প্রকাশ জনমানসে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য টল্স্টয়ের মত বিদগ্ধ দার্শনিক - ঔপনাসিক- চিন্তাবিদ্ বিংশ শাতাব্দীর প্রারম্ভেই গান্ধীজীর যুগান্তকারী কার্যধারাকে মানুষের সঠিক অস্তিত্ব রক্ষায় নবদিশা বলে চিহ্নিত করেছেন।

১৯২০ সালে গান্ধীজী সমগ্র ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা এবং এই সময় থেকে স্বাধীনতা লাভের কাল ভারত ইতিহাসে 'গান্ধী-যুগ' বলেই পরিচিত। সাহিত্যেও এই সময়টিকে একই পরিচয়ে অভিহিত করা যেতে পারে।গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ত বটেই, বাংলায় যেমন অগণিত কবি, ঔপনাসিক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার গান্ধী-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন ও রচনার বিষয়কে গান্ধী - নিষিক্ত করেছেন, তেমনই সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের মধ্যে

এই প্রবণতা ও ধারা লক্ষ্য করা গেছে। প্রেমচন্দ্রের 'প্রেমাশ্রম', 'রঙ্গভূমি' ও 'গোদান', জৈনেন্দ্র কুমারের 'ত্যাগপত্র' (হিন্দী), রতনলাল দেশাইয়ের 'গ্রামলক্ষী' (গুজরাটী), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' ও 'গণদেবতা', সতীনাথ ভাদুরীর 'জাগরী', মূল্ক রাজ আনন্দ, রাজা রাও, আর. কে. নারায়ণ, ভবানী ভট্টাচার্যের ইংরাজী উপন্যাস গান্ধীজীর সঙ্গে একাত্ম ও গান্ধী চিন্তা ও কার্যক্রমই মূল পথ ও প্রেরণা যার দ্বারা সকল দুঃখ, অত্যাচার, অনাচার, অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে এবং গান্ধীজীর নাম নিয়ে প্রয়োজনে চরম আত্মত্যাগেও উদ্বুদ্ধ হওয়া যাবে। 'রাজপথ'-এর 'সুরেশ্বর', 'ধাত্রীদেবতা'র 'শিবনাথ', 'জাগরী'র 'স্যানাল মশাই', আর. কে. নারায়ণের 'শ্রীরাম ও ভারতী' আমাদের গান্ধী আদর্শে উৎসর্গীকৃত, দেশ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ সত্যাগ্রহীদের কথা কেবল মনে করিয়েই দেয় না, একইরকম সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গান্ধীজী :

"আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই, কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ-শোক-তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি, দুঃখও জমে উঠছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সন্তরন করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ যাঁর তুলনা নেই তিনি ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন" - গান্ধীজী সম্বন্ধে লিখছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তিনি কেবল গান্ধীজীকে প্রথম মহাত্মা বলে সম্বোধনই করেননি, তাঁকে প্রকৃত 'গান্ধী-বোদ্ধা' বলা যায়। কবিতায়, প্রবন্ধে, নাটকে, ভাষণে তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং বলেছেন, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করেছেন 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' - চরিত্র সৃষ্টি করে গান্ধীজীকে অমরত্ব দান করেছেন, 'মুক্তধারা'-য় অহেতুক যন্ত্রের প্রতি আকর্ষণকে সমালোচনা করেছেন, 'বিসর্জন' নাটকে হিংসার বিরোধিতা করেছেন, 'শারোদোৎসব' নাটকে 'অছিবাদ' -এর কথা লিখেছেন, 'চন্ডালিকা' গীতিনাট্যে 'অস্পৃশ্যতা'-র বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এছাড়াও তাঁর রচিত বহু কবিতা, প্রবন্ধ, ইত্যাদিতে গান্ধীজীবন ও ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'মহাত্মা গান্ধী' শিরোনামে একটি সংকলন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছে যার মধ্যে গান্ধীজী - সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু প্রবন্ধ, কবিতা, ভাষণের অংশ স্থান লাভ করেছে।

সত্যসত্যই সৎ সাহিত্যের আলোয় গান্ধীজী সমান ভাস্বর। অবশ্য গান্ধী-সমালোচিত সাহিত্যও যথেষ্ট।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে শূন্য হাতে ফিরে এলেন এবং গ্রেপ্তারও হলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"নবজীবনের সঙ্কট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি' দিবে -
জীবনের ব্রত তব।"